ইতিহাসের গল্পে শরদিন্দু

দেবলীনা মুখোপাধ্যায়

বিরল সৌভাগ্য তাঁর। শতবর্ষ পেরিয়ে আজও তাঁর অমনিবাস বেস্ট সেলার। ব্যোমকেশ প্রাখর্যে আর চাতুর্যে আজও বাঙালির বিস্ময়। বরদাবাবুর অলৌকিক গল্প আজও বহুপ্রশংসিত। আর ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প উপন্যাস ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে আজও পাঠকের মনোহরণ করে। ছোট্ট পরিসরে দেখে নেওয়া যেতে পারে তাঁর ইতিহাসের সুরম্যগল্প উপন্যাসগুলি।

কি চোখে দেখেন শরদিন্দু ইতিহাসকে ? মৃৎপ্রদীপ গল্পে ১৯৩১-এ লিখেছেন, প্রাণিতত্ত্ববিৎ পন্ডিতেরা মাটি খুঁড়ে অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক জীবের যেসব অস্থিকঙ্কাল বার করেন, তাতে নিছক রক্তমাংস সংযোগ করে জীবিত কালে বাস্তব মূর্তিটি বানাতে বসে বিস্তর কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। আমাদের দেশের ইতিহাসও কতকটা ঐভূল্লোণ্ঠিত অতিকায় জন্তুর মত। যদি বা বহুক্লেশে সমগ্র কঙ্কালটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হওয়া দূরের কথা, তাহার সজীব চেহারাখানা যে কেমন ছিল তাহা আংশিকভাবে প্রতিপন্ন হইবার পূর্বেই বড় বড় পন্ডিতেরা অত্যন্ততেরিয়া হইয়া এমন মারামারি কাটাকাটি শু করিয়া দেন যে, রথী - মহারথী ভিন্ন অন্য লোকের সে কুক্ষেত্রের দিকেচক্ষু ফিরাইবার সাহস থাকে না।...যখনই আমাদের জন্মভূমির এই কঙ্কালসার ইতিহাসখানা আমার চোখে পড়েতখনই মনে হয়, ইহা হইতে আসল বস্তুটির ধারণা করিয়া লওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে কত না দুরূহ ব্যাপার! সেই দুরূহ কাজটাকে হৃদয়বেদ্য করে তোলার প্রয়াসেই শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্প - উপন্যাসের পরিকল্পনা।

ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের কোনো প্রয়াস তিনি করেন নি। শরদিন্দু আদতে ছিলেন ইতিহাস রস -পিপাসু রসিক পাঠক। আর হাতে ছিল তাঁর ঐতিহাসিক কল্পনার জাদুকাঠি। যে কল্পনার পাখায় ভর করে লেখকের সহচর হয় অনায়াসে সহজতায় পাঠকও ডানা মেলতে পারেন একাল - সেকালে ব্যাপ্তিতে। মন - ভোলাবার কেমন মনোহর মায়ারাজ্য এক - বঙ্কিম ছাড়া আর কে-ই বা গড়েছেন? দূরাভিসারী ভাষা আর সৌন্দর্যচর্চিত কল্পনার জাদুতেপাঠকের নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দবিহার গৌড়ে, বিজয়নগরে, কখনো বা পাটলিপুত্রে - শিপ্রানদীতীরে কিম্বা প্রাগ জ্যোতিষে আলাপচারিতা সোমদত্তা, ঈষাণ বর্মা, চন্দ্র বর্মা কিম্বা উচন্ড- নির্বাণের সঙ্গে। পাথুরে তথ্যের নিক্তিতে ওজন করতে গেলে বিভ্রান্ত হবেন বেচারা ঐতিহাসিক। কেননা তথ্যের বিস্তর গরমিল তাঁর ইতিহাসায়ী গল্প - উপন্যাসে কিন্তু ইশ্রিতহাস - রসের জমাটি আয়োজন তাতে এতটুকুও বিঘ্নিত হয় না। আর সেই মদিরার আকর্ষণেই বারবার ফিরে যাওয়া সেই সব লেখায়।

শরদিন্দুর পঁচিশটি গল্প আর পাঁচটি উপন্যাসের আশ্রয় ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে তিনি শিখেছিলেন ক্লাসিকর্ধমী গদ্য ছাড়া প্রাচীন ইতিহাসকে বিশ্বাসযোগ্য করা সম্ভব নয়। জীবনকথায় লিখছেন, ঐতিহাসিক গল্প লেখার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই শিখেছি, ভাষার মধ্যেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়। তাঁর ইতিহাস গল্পের কালসীমা প্রসারিত, প্রাক্ আর্যসভ্যতা নিয়ে লেখা ইন্দ্রতুলক থেকে বাঘের বাচ্চা গল্পে শিবাজীর সময়, বৌদ্ধযুগ থেকে শু করে তাঁর সমকালে বিহার ভূমিকম্পের ঘটনায়। ভিক্ষু অভিরাম আর গল্পকথক বিভূতিবাবুর সেই মূর্তিসন্ধানের এক গল্পেই গল্পকারের কৌশলে পেরিয়ে যায় দুই হাজার বছর। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মগ্ন পাঠক হলেও আর বঙ্কিমের সাহিত্যের হাত ধরে ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রেরণা অনুভব করলেও মোগল রাজঅন্তঃপুরে বা রাজপুতানার দেশপ্রেমে তাঁর তেমন কোনো মুগ্ধতা নেই। কেন? হতে পারে, নাটকে উপন্যাসে এত বেশি ব্যবহারে জীর্ণ বলেই সে পর্ব পরিত্যক্ত। আবার এমন মনে হয়, যে জাতীয়ত

াবাদের আগুন বুকে নিয়ে বঙ্কিমের সাহিত্যচর্চা, সেই সাগ্নিকের পবিত্র আগুন আদৌ কি শরবিন্দুমানসে জাগ্রত ছিল? আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রে সচেতনভাবে জাতিকে উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ করার আদর্শ, শরদিন্দু আদৌ গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করতে চানও নি।

তবু কেন বারবার ইতিহাস স্মরণ? শরদিন্দু বলেন, স্মৃতি সতত সুখের। আর অতীত প্রয়াণ রোমান্সকে দেয়স্বচ্ছন্দবিচরণের অঘনজ অবকাশ --এও জানা। যে মানুষটা কথার পর কথা সাজিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ পাঠককে স্রেফ মায়ারাজ্যে পথ হারিয়ে, পথ - ঘুরিয়ে জিতে দিতে চায় সে ইতিহাসের আশ্রয় নেবেই। কতক সেই মন নিয়ে শরদিন্দুর ইতিহাস স্মরন। মনে রাখতে হবে, recreation of India's past history as a reflection of nationalism -এ শরদিন্দুর আসক্তি নেই মনেহারী মায়ার াজ্য রচনার জন্য যে - যে উপকরণ চাই, তার আয়োজন হলেই তিনি খুশি।

প্রশ্ন জাগে মনে, কেন একাধিক গল্পে বৌদ্ধ যুগের পুনরাবৃত্তি ? শরদিন্দুর প্রথম জীবন কেটেছে উত্তর পূর্ব বিহারে -- সেকালের পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, শ্রাবস্তীতে। বৌদ্ধ ইতিহাসে আসক্তি তো স্বাভাবিকই। আরো মনে পড়বে, লেখকজীবনের সূচনা ১৯২৯ -এ আর সেরা গল্প উপন্যাসগুলি লেখা হচ্ছে ২৯ থেকে ৫১ -র মধ্যে। অর্থাৎ এক মহাযুদ্ধের অবসান এবং অারেক বৃহত্তর যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী আয়োজন। বিশ্বজুড়ে মানবজাতির নিষ্ঠুরতম বহ্যুৎসবে, খরা - মন্বন্তরের ক্রূর দিনগুলোতে শরদিন্দু মানবপ্রেমী বুদ্ধদেবকেই কি শরণাগতের রক্ষকরূপে বন্দনা করেন নি? উৎক্রান্তির পথ দেখেন নি কি বুদ্ধের মানবপ্রেমবাণীতে।

আর আছে হৃতগৌরব বাংলা আর বাঙালির কথা। বাঙ্গালার ইতিহাস নাই --- বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্ষেপটিশরদিন্দু ভুলতে পারেন নি। তাই পুনরাবৃত্ত হয় গৌরবময় বাংলার কথা। ১৯৫১ -র ২৩ ফেব্রুয়ারি ডায়রিতে লেখেন, আমি বাঙ্গালিকে তাহার প্রাচীন ট্রাডেসান্ - এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ চেষ্টা আর কেহ করে না কেন? ... যে জাতির ইতিহাস নাই, তাহার ভবিষ্যত নাই। শুধু গৌড়মল্লার বা চুয়াচন্দন নয় -- বেছে নেন তিনি ইতিহাসের সেইসব অধ্যায়, যেখানে আছে বাঙালির যুদ্ধযাত্রা, অস্ত্রচালনা, নৌযাত্রা, সমৃদ্ধকুটির শিল্প -- এমনকি অন্তরঙ্গ সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনকথা। এগুলিকে অবক্ষয়িত, হৃতসর্বস্ব তাঁর সমকালে গ্রহণীয় করার জন্য কিতবে তাঁর ইতিহাসের অবতারণা ? নাকি নিছক প্রবাসী বাঙালির চিরচেনা বাঙালিয়ানা?

শরদিন্দু জাত রোমান্টিক। সেই মন নিয়েই একে পর এক বেছে নেন তিনি নষ্ট সাম্রাজ্যের অবক্ষয়লগ্ন। কালের মন্দিরায় স্কন্দগুপ্তের বিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই চিহিত হয় গুপ্তসাম্রাজ্যের স্বর্ণশাসনের শেষলগ্ন। গৌড়মল্লারে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশো বছরের বাংলার মাৎস্যন্যায়। তুমি সন্ধ্যার মেঘে বিগ্রহপালের অবসন্ন শাসনকাল অর্থাৎ পালসাম্রাজ্যের অন্তিম প্রহর। তুর্কী আক্রমণের ঠিক আগেকার ভারতের নানা রাজ্যের বিরোধি মনোমালিন্যের আলেখ্য।দাক্ষিণাত্যের সদম্ভ বিজয়.নগররাজ্যের প্রায় অবসান নিয়ে তুঙ্গভদ্রার তীরে। কেন? পাঠকের মনোহরণই যে শরদিন্দুর ইচ্ছা। আর এত আমাদের সবার জানা, সমৃদ্ধির ঐশ্বর্যের চেয়ে পতনের ইতিহাস অনেক বেশি মনোহারী। জয়ের উষ্ণ আনন্দেরর চেয়ে হারানোর বিধুরতায় রোমান্সের প্রশ্রয় অনেক বেশি। তবে আমাদের নীট প্রাপ্তি কি ? যে কোনো সাম্রাজ্যের অন্তিম প্রহরের ইতিহাস তো তেমন আড়ম্বরে লেখা হয় না, গবেষক ছাড়া তা জানার বিশেষ পথও থাকে না। শরদিন্দুর হাত ধরে ভাঙনের ইতিহাসের কিছুটা অন্তর ধারণা আমরা করতে পারি। শরদিন্দু যতই বলুন না কেন, ঐতিহাসিক গল্প রচনার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে -- এই পতনের আলেখ্যের প্রতি পক্ষপাত কিন্তু বঙ্কিম ঘরানার হলেও তাঁকে স্বক্ষেত্রে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

কালের মন্দিরা-র সূচনায় শরদিন্দু নিজেই জানান, আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল স্কন্দগুপ্তের চরিত্র ঐতিহাসিক। গৌড়মল্লারে-র ভূমিকায় জানাচ্ছেন, নীহার রায়ের বাঙালির ইতিহাস থেকে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ নিয়ে ভাস্কর বর্মা হর্ষবর্ধনের কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ির ইতিহাস-এ উপন্যাসের আশ্রয়। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য? এই সময়ে বাঙালির চরিত্র, সংস্কৃতি, গ্রাম্যজীবন, নাগরিকজীবন কিরূপ ছিল তাহা অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই জনজীবনমুখী সৃজনে ইতিহাসের বাতাবরণকে আশ্রয় করে অবাধ হয়েছে কল্পনা। চালচিত্রে এসেছে মানব - গোপা - রঙ্গনা - বজ্র - কুহু - শীলভদ্র - মণিপদ্ম - ইতিহাস যাদের মনে রাখে নি, কিন্তু সেদিনের প্রতিবেশে যারা অবিতর্কিতভাবে বিশ্বাসযোগ্য। প্রত্যেকে নিজের ঘৃণা - ভালোবাসা, প্রেম - প্রতিহিংসা নিয়েনিজের মতো করে নিজের জন্য বাঁচতে চায়। কিন্তু অজান্তেই হয়ে পড়ে ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র। তাদেররই সূত্রে ইতিহাস বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

তুমি সন্ধ্যার মেঘে ইতিহাসে গাওয়া অনেক চরিত্রে সমাবেশ। আবারকল্পনাও সমান সত্রিয়। এই যেমন জয়চাঁদের ফন্দি নিয়ে লেখক নিজেই বলেন, স্বকপোলকল্পিত ভাবার কোনো কারণ নেই। অনুমান হয়, তৎকালের রাজাদের এই ধরণের নষ্টামি একটা ব্যসন ছিল। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় -এ উপন্যাস পাঠে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন সপ্রশংস চিঠি, আমি সব চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি, একেবারে সেকালে গিয়ে উপকৃত হচ্ছি। ... সেকালের উপযোগী কথোপকথন সে এক অভিনব কল্পলোক। তুঙ্গভদ্রার তীরে লেখকের কথায় Historical Fiction । ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং আখ্যান সংগৃহীত পঞ্চদশ শতকের নানা পান্ডুলিপি থেকে। অবশ্য মণিকঙ্কণা, বিদ্যুন্মালা, চিপিটক কিম্বা অর্জুন ভেসে আসে কল্পনায়। ইতিহাসের বাতাবরণ অটুট রেখে তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণসহ্যাদ্রির সুদূর দক্ষিণপ্রান্তে -- বিজয়নগরের পথে পথে। শরদিন্দু বলেন, তুঙ্গভদ্রার এই ঊর্মিমর্মর ইতিহাস নয়, স্মৃতিকথা। সকল ইতিহাসের পিছনেই স্মৃতিকথা লুকাইয়া আছে। ইতিহাসবেত্তাকে রীতিমত বিভ্রান্ত করে তিনি ঋাসকরেন, যেখানে স্মৃতি নাই সেখানে ইতিহাস নাই। তুঙ্গভদ্রার তীরে তুঙ্গভদ্রার সেই স্মৃতিপ্রবাহ Anthony Hope -এর 'The Prisoner of Zenda' অবলম্বনে শরদিন্দু লিখেছিলেন ঝিন্দের বন্দী। আশর্চ্য মুন্সিয়ানায় কাহিনির ভারতীয়করণ। শরদিন্দু গল্পকে নিয়ে গেলেন মধ্যভারতের ছোট্টো স্বাধীন ইংরেজের মিত্ররাজ্য ঝিন্দে। এল ঝিন্দ - ঝাড়োয়ার অতীত ইতিহাস। তবে এ আসলে সমসময়ের সদ্যপ্রয়াত ঝিন্দ মহারাজ ভাস্কর সিংহ এবং তার দুই পুত্র কুমার সিংহ এবং কুমার উদিত সিংহের গল্প। ইতিহাসাশ্রয়ী কোন্ উপাদান না মেলে? প্রেম - প্রতিহিংসা, ত্রূর ষড়যন্ত্র, অস্ত্রে ঝনৎকার - সর্বোপরি দূরাভিসারী ভাষার মেদুরতা - সবই আছে। সবচেয়ে আশর্চ্য, সব চরিত্রেরই লালন শরদিন্দুর শিল্পিমানসে। আর আমাদের একালের পাঠকের প্রাপ্তি? - ষোলো আনা ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্সের আস্বাদ।

প্রমথনাথ বিশী শরদিন্দুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, আপনার গল্প পড়তে পড়তে বঙ্কিমবাবুকে মনে এনে দেয়- তিনি ছাড়া আপনার জুড়ি নেই। (৬ ডিসেম্বর, ৬৫) আর শরদিন্দু বলেন - ইতিহাসের গল্প লিখেই বেশি তৃপ্তি পেয়েছি।

আজকাল আমরা বলি, ইতিহাস হলো সেকাল - একালে চিরায়ত কথোপকথন। ইতিহাসকে বুঝতে হলে, বুঝতে হবে সেদিনের মানুষকেও। শরদিন্দু এ - ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন কাশী - কোশল - লিচ্ছবি - মগধ - পাটলিপুত্র - প্রাগজ্যোতিষের নানা মুখ তিনি সযত্নে আঁকেন। পাশাপাশি তাঁর প্রতীতি, ইতিহাসের অমোঘ শক্তি নিয়তি হয়ে আসে মানুষের জীবনে। যেমন রক্তসন্ধ্যা। ভাস্কো - ডা - গামার নেতৃত্বে পর্তুগীজ নাবিকদের কালিকট আগমনেরইতিহাস নিয়ে এই গল্প। কালিকট - রাজ সামরীর কাছ থেকে পর্তুগীজ নাবিকদের এদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভও ইতিহাস সিদ্ধ। সেই ইতিহাসের চালচিত্র সজীব হয়ে ওঠে মির্জা দাউদের তীর্থযাত্রার সূত্রে। মক্কাশরিফ থেকেতীর্থফেরত দাউদের নৌবহর আত্রমণ করে পর্তুগীজ জলদস্যু। ধবংস হয় দাউদের নৌবহর পরিজন অর্থাৎ মানুষের ওপর ইতিহাসের অমোঘ শক্তির জয়। একি নিছক কোনো পরিবারের কশ ধবংসকাহিনী? আসলে যে যে ভারতেতিহাসের সংকেতগর্ভ পটপরিবর্তনের নিষ্ঠুর পালা। তারই অনিবার্য ইঙ্গিতে গ্রন্থশেষ - সূর্য তখন সমুদ্রপারে অস্তমিত হইয়া অন্য কোনো নতুন গগনে উদিত হইয়াছে। শরদিন্দু তাঁর ছোটগল্পে বারবার দেখান, কেমন করে নিজের মতো করে বাঁচতে চাওয়া ফেলে আসা দিনের মানুষগুলো অগোচরে ইতিহাসের ত্রীড়নক হয়ে ওঠে।

আগেই বলেছি, মধ্যযুগে বাংলার সমৃদ্ধ নৌযাত্রা এবং অর্থনৈতিক শ্রী নিয়ে শরদিন্দুর গর্বের অন্ত ছিল না। সুবিস্তৃত বর্ণনার সূত্রে শরদিন্দু পাঠকদেরও বারবার চান সেই গর্বের অংশীদার করে নিতে। বানিজ্য তরী নিয়ে দক্ষিণ - পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ ফেরত নবদ্বীপ ঘাটে আসে চন্দনদাসের বাণিজ্য তরী। আমরা জানতে পারি, সে মরশুমে প্রতিসপ্তাহে দুটি করিয়া নৌকা আসিয়া লাগে নবদ্বীপের ঘাটে। একি তবে সেই হায় রে কবে কেটে গোছের সরল হতাশা? কিন্তু নিছক Nostaligia নয়। আদতে শরদিন্দুর মধ্যে জাগ্রত এক দৃপ্ত প্রতিবাদী সত্তা - যে সমকালীন পশ্চিমমুখী আঙ্গিকসর্বস্ব সাহিত্যচর্চার বিদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালিয়ানাকে ব্যবহার করে তার হাতিয়ার হিসাবে।

ইতিহাস তো শুধু রাজা - রাজড়া, যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা নয়। ফেলে আসা দিনের আর্থ- সামাজিক এবং অবশ্যই রাজনৈতিক জীবনস্পন্দন ইতিহাসের উপজীব্য। শরদিন্দুর শিল্পকলায় নামি - দামি রাজ্য নেই বড়ো - নেই রক্ত- ঝরানো ভারত কাঁপানো যুদ্ধ - যেমনটা পেয়েছি আমরা বঙ্কিমসাহিত্যে, কিম্বা রমেশ দত্তে। আছে বরং ইতিহাসের চালচিত্রে মান - না - জানা কত রক্তমাংসের নারীপুষ তাদের কামনা - বাসনা, ঘৃণা - প্রতিহিংসা, স্বপ্ন - স্পপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে। শরদিন্দুর

ইতিহাসের গল্পে পরমপ্রাপ্তি সেদিনের সেই সমাজমানস। এত যত্নে এমন সহমর্মিতায় এতদিন কেউ বলে নি তাদের কথা, গল্পে কি উপন্যাসে। তাও কোনো নির্দিষ্ট কালের ইতিহাস নয়। যেমন, প্রদ্যুম্ন - মাঘবার প্রাগজ্যোতিষ গল্পে নাই অ ার্যযুগের যোদ্ধৃজীবন। বিষকন্যায় খ্রিষ্ট জন্মের আগে পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধির আলেখ্য।মাহরণে চন্দ্রগুপ্তের সমকালে গুপ্তসা ম্রাজ্যের নাগরিক জীবন। মৃৎপ্রদীপে গুপ্তযুগের রাজ্যশাসনব্যবস্থা, বিশ্বাসঘাতকতা গুপ্তচরবৃত্তির সচেতন বর্ণনা। কালিদাস, বরাহমিহিরের কালে উজ্জয়িনীর সাংস্কৃতিক জীবন অষ্টমসর্গে গল্পে বৌদ্ধদের সংঘজীবন নিয়ে ম ও সংঘ, চন্দনমূর্তি। শঙ্খকঙ্কণ গল্পে আলাউদ্দীন খিলজির রাজত্বকালে বিন্ধ্যগিরির উপত্যকায় নিষ্কম্প হিন্দুদের জনজীবন। চুয়াচন্দনে পঞ্চদশ শতকের বাংলা অর্থ - রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনের অনাচারে সুবিস্তৃতমনোজ্ঞ ছবি। তালিকা দীর্ঘতর করে কাজ নেই। কথা একটাই। ইতিহাসের বড়ো মাপের মানুষ শরদিন্দুরগল্পশালায় প্রায় নেই -- আছে ফেলে আসা দিনের বিচিত্র জনজীবন। এ এক আশ্চর্য প্রয়াস, সন্দেহ নেই।

একটু দুঃসাহসী মন্তব্য করা থাক্ না! ঐতিহাসিক শব্দটা বাদ দিলে গল্পগুলির ঘটনাবৈচিত্র, নাটকীয়তা বা বর্ণনায় জাদু এতটুকুও কি হানি হয় ? নিছক রোমান্টিক গল্প হিসেবেই দিব্যি সমাদৃত হতে পারে না কি শরদিন্দুর এই গল্পগুলি?

যতবার পড়েছি প্রশ্ন জেগেছে আমার মনে, ইতিহাসের গল্পে শরদিন্দু এত শিথিল কেন? যে মানুষটা এতটাই আঁটোসাঁটো, পরিমিত ব্যোমকেশে, কিশোর গল্পে -- ইতিহাসকে আশ্রয় করলেই -- শৈলীতে কেন তাঁর এতটাই শৈথিল্য আসে ? রোম ান্সের গুণে বা দোষেই কি এই অতিকথন? নাকি সাজিয়ে গুছিয়ে বেশি কথা বলার আকুলতা?

ইতিহাসের অনেকগুলি গল্পের শিল্পরূপের মধ্যে লুকিয়ে আছে আশ্চর্য এক কৌশল। শরদিন্দুর গল্পে কোথাও স্বয়ং লেখক জাতিস্মরের ভূমিকা দিয়েছেন, কোথাও বা স্বতন্ত্র চরিত্রের অবতারণা করে তার মাধ্যমে গল্পটিকে পাঠানো হয়েছে জন্ম ান্তরে। শরদিন্দু জন্মান্তরে এবং সম্ভবত জাতিস্মরেও বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৫৬ -এ প্রকাশিত তাঁর এক গল্পগ্রন্থের নামও জা তিস্মর। মাহরণ গল্পে লিখছেন, আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সঙ্গে ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। অমিতাভ গল্পের ছিয়াত্তর টাকা মাইনের রেলকর্মীটি জাতিস্মর। রাজগীরের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তার মনে হয়েছে, এস্থান অ ামার চিরপরিচিত, একবার নহে - শত সহস্রবার আমি এইখানেই দাঁড়াইয়াছি। কণিষ্কের সমসময়ে নাম ছিল নাকি তার পুন্ড্রীক, বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর কালে কুমারদত্ত। পেশায় সে ছিল রাজভাস্কর। তার স্মৃতিচিত্রের সূত্রে আমরা ফিরে যাই তথাগতের সমকালে লিচ্ছবি - কোশল - মগধে। কিম্বা মৃৎপ্রদীপ। প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া গিয়েছিল তুচ্ছ এক মাটির প্রদীপ মিউজিয়ম তাকে স্থান দেয় নি। অবহেলা করেছিল পুরাতত্ত্ববিদও। কিন্তু সামান্য সেই প্রদীপ জ্বাল াতেই লেখকের সামনে মুছে গিয়েছিল বর্তমান। ভাস্বর হয়ে উঠেছিল ষোলোশ বছর আগেকার কথা - সুদূর অতীতের জন্মান্তরের স্মৃতি। সেই প্রদীপ সম্মুখে ধরিয়া তাহারই আলোতে এই কাহিনি লিখিতেছি। সেতু গল্পটি আবার ভেসে আসে স্বপ্নে। বিভ্রান্ত লেখক বলেন, এ - কি স্বপ্ন? না আমারই মগ্নচৈতন্যের স্মৃতিকন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল আমার পূর্বতন জীবনের ইতিবৃত্ত? রল্লা - তন্ডুর সেই গল্প ফুরোয় নিদ্রা এবং নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গে আরেক গল্পে ইতিহাসের এক পন্ডিত পুঁথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ঘোরে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন -- আট হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম। স্বপ্নবাহিত আমরাও ফিরে গেলাম সেই হরপ্পা--মহেঞ্জোদাড়োরও আগের প্রত্ন - ভারতে। লেখা হল ইন্দ্রতূলক।

কথা হচ্ছে কেন বারবার জাতিস্মর কিম্বা স্বপ্নের প্রসঙ্গ আসে এই গল্পমালায়? আসলে এই শৈলীর মাধ্যমে বর্তমানে দাঁ ড়িয়েও অনায়াসে অতীতকাহিনির মূল্যায়ন করা যায়। ইতিহাসকে যুক্ত করা যায় আধুনিকতার সঙ্গে। কল্পানাকে ব্যাহত করা যায় একাল সেকালের ব্যাপ্তিতে। আর ঐ সুগম পথে কাহিনিও বিশ্বাসযোগ্যতা পায়।

নতুন করে বলার নয়, সমকালীন হলেও কল্লোল কালিকলমের সঙ্গে তাঁর আদৌ আঁতের মিল ছিল না। ঐতিহ্যের দেউলভাঙার খেলায় ছিল না এতটুকুও আসক্তি। আনন্দবাদকে অস্বীকার করে, বর্তমানকে ভেঙেচুরে, অগ্রাহ্য করে, শূন্যব াদের প্রতিষ্ঠা তাঁর মনকে পীড়িত করেছিল। আদতে শরদিন্দু আলোকসারথি। অতীতের চলচিত্র থেকে নিরালোক বর্তমানে তিনি চান আলোর কণা ছড়িয়ে দিতে। অমিতাভ গল্পে শুনি আকুল প্রার্থনা, অমিতাভ, আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দাও, অ ালোকের পথ দেখাও।... শ্রীমান্, আমার হৃদয় অন্ধকার। আজ তোমার মুখে দিব্যজ্যোতি দেখিয়াছি। ঐ জ্যোতির কণাম াত্র আমাকে দান কর। সে গল্প স্নিগ্ধ হয়েছিল অমিতাভর আশীর্বাণীতে, পুত্র তোমার অন্তরের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইবে, অ

াপনিই আলোকের পথ দেখিতে পাইবে।

ম ও শঙ্খ গল্পে অন্তিম মুহূর্তে প্রতিধ্বনিত হয় স্থবিরের কণ্ঠে, ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত আকুল প্রার্থনা -- হে শ াক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, হে গৌতম, অন্তিমকালে আমাকে চক্ষু দাও। তমসো মা জ্যোতির্গময় - তমসো মা জ্যোতির্গময় --। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধবন্দনা কি খুব দূরের? শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য / করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য। চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে গল্পে সংকেতগর্ভ সমাপ্তি পংক্তি - মানবজাতির শমনবৃত কণ্ঠ হইতে আজিও ঐ আর্তবাণীই নিঃসৃত হইতেছে। এই আলোয় নেশায় জিতিয়ে দেয় তাঁর গল্পে মানবধর্মকে। ইতিহাসের থেকেও অতীতের আলোকোন্মুখ মানুষের কথাই প্র াধান্য পায় বেশি। একাল- সেকালের সেই সযত্ন - চর্চিত সেতুবন্ধ পেরিয়ে শরদিন্দুর সহচর হয়ে আমরা পাঠকরাও পৌঁছ াই গিয়ে সেই অখন্ড পরিপূর্ণ - প্রত্যয়ে ভরপুর, ফেলে আসা দিনগুলোয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com